# ভারতে বাংলা ভাষার সংগ্রাম - ২১শে জুলাই, ১৯৮৬

দিলীপ কান্তি লস্কর, ৮ আগস্ট ২০২০

*কয়েকদিন আগেই গেল ২১ জুলাই ।*

*বরাক উপত্যকার ভাষা সংগ্রামের ইতিহাসের পাতায় একটি উল্লেখযোগ্য দিন ।*

*কি এই দিনের তাৎপর্য ??*

*আসুন জেনে নেই দিলীপ কান্তি লস্করের পুর্বপ্রকাশিত এই লেখা থেকে ...*

*ঈশান কথার ৩ সংখ্যায় বিস্তৃত এই লেখার প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় কিস্তি একসাথে এই সংখ্যায় ...*

**প্রেক্ষাপটের প্রেক্ষাপট**

-----------------------------------

১৯৮৫ সালের ১৫ ই আগস্ট ভারতের ৩৯ তম স্বাধীনতা দিবসে কংগ্রেস সভাপতি তথা ভারতের কনিষ্ঠতম প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী ভোররাতের ব্রাহ্ম মুহূর্তে আসাম চুক্তি নামক যে চুক্তি তে উপনীত হলেন তার ছয় নম্বর ধারাটি ছিল এইরকম –

'Constitutional, legislative & administrative safeguards as may be appropriate, shall be provided to preserve, protect, promote the cultural, social & linguistic Identity & heritage of Assamese people'

খুব ভালো কথা। আসামে অনসমিয়ায়ারা পরশ্রীকাতর নয়। কিন্তু আসাম কি শুধু অসমীয়া ভাষীদের ? বহুভাষিক আসামে অন্যান্য ভাষিক গোষ্ঠীর চিন্তা করারও যে দরকার ছিল প্রধানমন্ত্রীজীর। তিনি কি তার করেছিলেন ? না , করেননি।

ভাষিক সাম্প্রদায়িকতার জঠরে জন্ম নিয়ে ভাষা দাঙ্গায় লালিত হয়ে উঠা আন্দোলনকারীদের যে গগনচুম্বী মাথাটি শ্রদ্ধেয়া শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী ভুলুণ্ঠিত করে ছেড়েছিলেন, সেই দুর্বিনীত শিরদের সোহাগ চুম্বন দিয়ে রাজীবজি গগনবিদারী করে তুললেন। আসামে বাঙালিদের জন্য এ এক ঐতিহাসিক পরিহাস - এই চুক্তি তেই নিহিত ছিল ভাষা-সার্কুলারের বীজ।

(c) Ishan Kotha

**প্রেক্ষাপট - আসাম সাহিত্য সভার ভূমিকা**

-----------------------------------

১৯৮৬ সালের ফেব্রুয়ারিতে কামপুরে অনুষ্ঠিত আসাম সাহিত্য সভার বার্ষিক অধিবেশনের এই ব্যাপারে এক বিরাট ভূমিকা রয়েছে।আসাম সাহিত্য সভা ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার অসমিয়া সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবীদের প্রতিনিধিত্ব মূলক প্রতিষ্ঠান। উগ্র অসমীয়া জাতিয়তাবাদী আন্দোলনের অন্যতম হোতা অসম গনসংগ্রাম পরিষদের বিশিষ্ট শরিক এই সাহিত্য সভা। বাস্তবতঃ দেখা যায় এটি সাহিত্য সভা হলেও বিভিন্ন সরকারী নীতি ও আইন প্রনয়নের ব্যাপারে কখনো প্রচ্ছন্ন, কখনো দিবালোকের মতো স্পষ্ট প্রতিভাত ও মূখ্য ভূমিকা রাখে। উক্ত অধিবেশনে গৃহীত একটি প্রস্তাবে আসামে রাজ্যভাষা আইনের ৫ নং ধারাটি সংশোধনের জন্য দাবি করা হয়। যে ধারায় বরাক উপত্যকার জন্য বাংলা ভাষায় সরকারি কাজকর্ম চালানোর সংস্থান রয়েছে, এটা সেই ধারা। এই সাহিত্য সভার বক্তব্য- যেহেতু এ ঐ ধারা মোতাবেক বরাক উপত্যকায় অসমিয়া ভাষা প্রয়োগের ক্ষেত্রে বাঁধার সৃষ্টি হচ্ছে, তাই ধারাটির এমনভাবে সংশোধন হওয়া প্রয়োজন যাতে বরাকের সরকারি কাজে এবং ছাত্র দের অধ্যয়নে অসমিয়া ভাষা বাধ্যতামূলক করা হয়। আসামের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্ল মহন্ত এই অধিবেশনে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এবং সভাকে কথা দিয়েছিলেন অসমীয়া ভাষা ও সংস্কৃতি বিকাশ অব্যাহত রাখার জন্য সভা যে পরামর্শ দেবেন সরকার তা বাস্তবায়িত করার চেষ্টা করবে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে বরাক উপত্যকার বঙ্গভাষী মানুষ কোন ভাষা ব্যবহার করবেন তা ঠিক করে দিচ্ছেন ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার বুদ্ধিজীবীরা এবং একতরফা ভাবেই। একভাষার সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবীদের অন্যভাষার ওপর এমন আগ্রাসী ও অগনতান্ত্রিক মনোভাব - এই হচ্ছে আসাম সাহিত্য সভার চরিত্র।

ব্যাপারটি এখানেই শেষ নয়, উক্ত অধিবেশনে প্রধান অতিথি ছিলেন বিশিষ্ট অসমিয়া পন্ডিত ডঃ মহেশ্বর নেওগ। তিনি তার বক্তব্যে রাজ্যভাষা আইনের আর একটি ধারা দাবি করেন যে ধারায় বরাক উপত্যকার সঙ্গে দিশপুরের যোগাযোগে ইংরেজি বিকল্পে হিন্দি ব্যাবহার করার বিধান রয়েছে। না, ব্যাপারটা এখানেই শেষ নয় আরেকটি প্রস্তাব ও সাহিত্য সভা গ্রহণ করে যে রাজ্যের সব স্কুলে অসমিয়া ভাষা বাধ্যতামূলক করতে হবে। প্রস্তাবের পুনর্বয়ান থেকে এটা দাঁড়ায় যে আসামের অনসমিয়া ছাত্ররা ঐচ্ছিক বিষয় বেছে নিতে পারবে না, তাদের বাধ্যতামূলকভাবে অসমিয়া পড়তে হবে ঐচ্ছিক বিষয়ের পরিবর্তে। অথচ অসমিয়া ছাত্রদের ক্ষেত্রে ঐচ্ছিক বিষয়ের দ্বার থাকবে সম্পূর্ণ উন্মুক্ত। এটাকে ভাষিক বৈরিতা বা আগ্রাসনমূলক মনোভাব বা বৈমাত্রেয় আচরন যাই বলা হোক না কেন , সরকারকে এভাবে প্ররোচিত করার পূর্ন পদক্ষেপ নিয়েছিল আর কেউ নয়, অসম সাহিত্য সভা ই। হায় ! সাহিত্য শব্দটির এখানে কি করুণ প্রয়োগ ! রামায়ণের কুঁজি বা মহাভারতের শকুনির মতো নয়কি ?

**প্রেক্ষাপট - আসাম মধ্যশিক্ষা পরিষদের সার্কুলার (SEBA CI RCULAR)**

-----------------------------------

প্রাক স্বাধীনতা যুগে ভারতের জাতীয় আন্দোলন নিয়ে বলতে গিয়ে গোখলে মন্তব্য করেছিলেন –

'What Bengal thinks today India thinks tomorrow' এখানে আমরা দেখতে পেলাম 'What Assam Sahitya Sava thinks today, Assam Government thinks tomorrow.'

ব্যাপারটা যে সত্যি বিশেষতঃ আসামের বাঙালিদের ভাগ্য বিষয়ে, তা আসাম সরকারের Board of Secondary Education,(মধ্যশিক্ষা পর্ষদ)এর সার্কুলারের সঙ্গে অসম সাহিত্য সভার প্রস্তাব গুলোকে তুলনা করলেই জলবৎ তরলং পরিস্কার হয়ে যায়। ১৯৮৬ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি পর্ষদ এই মর্মে একটি সার্কুলার প্রতিটি বিদ্যালয়ে পাঠালেন যে চলতি শিক্ষাবর্ষ থেকে অনসমিয়া মাধ্যমের বিদ্যালয় গুলোতে অসমীয়া ভাষা শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হলো। এই ঘোষণা মতে অনসমীয়া দের পঞ্চম থেকে সপ্তম শ্রেণী পর্যন্ত হিন্দির পরিবর্তে অসমিয়াকে তৃতীয় আবশ্যিক ভাষা হিসেবে পড়তে হবে এবং অষ্টম শ্রেণি থেকে তৃতীয় ভাষা হিসেবে বরাক উপত্যকা সহ রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলের অনসমিয়া ছাত্র ছাত্রীদের অসমিয়া শিখতে হবে এবং ১৯৮৯ এর হাইস্কুল শিক্ষান্ত পরীক্ষা থেকে প্রতিটি এমন পরীক্ষায় অসমিয়া ভাষার পরীক্ষা দিতে হবে। পর্ষদ ঐ সার্কুলারে অষ্টম শ্রেণি থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত তৃতীয় ভাষার সংজ্ঞা কি হবে তাও ব্যাখ্যা করে দিয়েছিলেন । তা নিম্নরূপ :

"যেসব ছাত্র-ছাত্রী প্রথম ভাষা বা মাধ্যম হিসেবে বাংলা, মনিপুরী বা অন্যভাষা গ্রহণ করবে, তাদের দ্বিতীয় ভাষা ইংরেজি ও তৃতীয় ভাষা অসমিয়া নিতে হবে। যাদের প্রথম ভাষা বা মাধ্যম হবে অসমিয়া তাদের দ্বিতীয় ভাষা ইংরেজি ও তৃতীয় হিসেবে অন্য যেকোনো ভাষা (যেমন হিন্দি) নিতে হবে। যারা প্রথম ভাষা ইংরেজি গ্রহণ করবে তাদের দ্বিতীয় ভাষাও ইংরেজি ও তৃতীয় ভাষা অসমিয়া গ্রহণ করতে হবে।"

সার্কুলার টিকে আপাতদৃষ্টিতে যতটা বৈষম্য মূলক মনে হয় কার্যতঃ তার আরও বেশি। এই নির্দেশ আসামের অনসমিয়াভাষী তথা বরাকবাসী ছাত্রদের রাষ্ট্রভাষা শেখার পথ রূদ্ধ করছে, অপরপক্ষে অসমীয়া ছাত্রদের সে ব্যাপারে পূর্ণ সুযোগ দিচ্ছে। কারণ ,পঞ্চম থেকে সপ্তম শ্রেণী পর্যন্ত হিন্দির পরিবর্তে অসমিয়াকে তৃতীয় আবশ্যিক ভাষা হিসেবে নির্দিষ্ট করা হয়েছে, অথচ অসমিয়াদের জন্য তৃতীয় আবশ্যিক ভাষা থাকছে হিন্দী ই।

অনসমিয়া তথ্য বরাকবাসীদের কলেজে পড়ার সময় স্বভাবতই বিজ্ঞান, কলা ও বাণিজ্য বিভাগের দুটো ঐচ্ছিক বিষয়ের মধ্যে একটি বাদ দিতে হবে। এতে উচ্চশিক্ষার সুযোগ হবে সীমিত। কারণ, বঙ্গভাষী এবং অন্যান্য অনসমীয়া দের জন্যে স্কুলে থাকছে তিনটি অবশ্যপাঠ্য ভাষা, অসমিয়াদের জন্য দুটো। কারণ, অনসমীয়াদের জন্য অষ্টম থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত অসমিয়াকে আবশ্যিক ঐচ্ছিক বিষয় করা হয়েছে। এই পাঠক্রম বরাকবাসী ছাত্রদের শিক্ষাক্ষেত্রে সমান সুযোগ থেকে বঞ্চিত করে। প্রথম ভাষা হিসেবে বাংলা, মৈতৈ, বিষ্ণুপ্রিয়া, হিন্দি, ডিমাসা প্রভৃতি মাতৃভাষা বর্জন করার এবং পরিবর্তে অসমিয়াভাষা গ্রহণ করার পক্ষে পরোক্ষ দূরভিসন্ধিমূলক প্ররোচনা দিচ্ছে। ঐচ্ছিক বিষয়কে ছাত্রদের স্বাধীনভাবে পছন্দ করে নেবার সুযোগ কেড়ে নিয়ে এই সার্কুলার হয়ে উঠেছিল একটি অনৈতিক, অমানবিক নির্দেশ। ধরা যাক বরাকের কোন ছাত্র যদি হিন্দি শিখতে চায় সেক্ষেত্রে তার পাঠ্যভাষা হবে ৪-টি। যদি এরপর সে সংস্কৃত শিখতে চায় তবে ভাষার সংখ্যা হবে পাঁচ। যা অসম্ভব। আরো আছে। তাঁর উন্নত গনিতকে ঐচ্ছিক করার কোনও উপায় নেই। ফলতঃ বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষার উচ্চাশা থেকে বাধ্য হয়েই তাকে নিরত থাকতে হচ্ছে, নিরত থাকতে হচ্ছে বোর্ডের পরীক্ষায় ভালো রেজাল্ট করা থেকে অথচ অসমিয়া ছাত্রদের এসব কিছু প্রভাবিত করছে না। কাজেই এই সার্কুলার অগণতান্ত্রিক ও বটে। একমাত্র সূক্ষ্ম ছলেবলে অসমিয়াকে চাপিয়ে দিয়ে অসমিয়াকরণছাড়া এর আর অন্য কোন উদ্দেশ্য থাকতে পারে না।

ClikhanKotha

**প্রতিক্রিয়া ও প্রতিরোধ**

-----------------------------------

মাতৃভাষা সংগ্রামের ঐতিহ্যবাহী বরাকবাসী বোকা নন, তার প্রমাণ ইতিহাসেই ছড়িয়ে রয়েছে। এ ধরনের চক্রান্তের বিরুদ্ধে তাঁরা রুখে দাঁড়িয়েছিলেন ১৯৬১ সালে। ১৯ শে মের ১১ শহিদের রক্তের বিনিময়ে অর্জন করেছিলেন বাংলা ভাষার অধিকার। ভাষা সার্কুলার দিয়ে ভাষার অধিকার কেড়ে নেবার ইতিপূর্বের ষড়যন্ত্র ও তারা রুখেছিলেন ১৯৭১ এর ভাষা সংগ্রামের মাধ্যমে। ফলতঃ এবার ও মুখ বুজেনি বরাক। শুরু হলো প্রতিক্রিয়া। তীব্র ক্ষোভে ফেটে পড়ল বরাক। কাছাড় শিক্ষা সমন্বয় সমিতি এক প্রতিবাদ পত্র পাঠিয়ে পর্ষদকে এই সার্কুলার প্রত্যাহারের আর্জি জানালো। কাছাড় ইউনিয়ন টেরিটরি দাবি কমিটি এই সার্কুলারের বিষয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করলো। গণতান্ত্রিক ছাত্র যুব সংগ্রাম কমিটি এই সার্কুলারের প্রতিবাদে ব্যাপক বিক্ষোভ কর্মসূচি গ্রহণ করলো। এই কর্মসূচির মধ্যে ছিল :

১) প্রতিটি থানা কমিটি ও মহকুমা কমিটি ১৫ মার্চ সাইকেল মিছিল বের করবে।

২) ১৭ মার্চ থেকে বরাক উপত্যকার সমস্ত স্কুল কলেজের ক্লাস বয়কট করা হবে, সার্কুলার প্রত্যাহার না হওয়া অব্দি।

৩) ২৪ ও ২৫ মার্চ সব থানা এবং মহকুমা কমিটির সদস্য রা এস বি ও এবং গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসে অনশন ধর্মঘট করবে।

৪) পাঁচ এপ্রিল অফিস আদালতে পিকেটিং করবে।

প্রতিবাদ জানালো সংযুক্ত সংখ্যালঘু মোর্চা। ব্রহ্মপুত্র উপত্যাকার উপজাতি সংগঠন গুলোও গর্জে উঠলো। ১৮ জুন উত্তর কাছাড় ও কার্বিয়াংলং জেলায় সর্বাত্মক ধর্মঘট সফল হয়। করিমগঞ্জ স্টুডেন্টস ইউনিয়ন কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের দাবিতে ও অসমিয়া চাপানোর বিরুদ্ধে ৪৮ ঘন্টা রিলে অনশনের সিদ্ধান্ত নিল।

৮৬'র ৩০ শে মে বরাক উপত্যকা সংগ্রাম সমন্বয় সমিতির জন্ম হয় গান্ধী ভবনে , ভাষা সার্কুলারের প্রতিবাদে ইতিমধ্যেই যেসব সংগঠন আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন তাদের প্রায় সবাইকে নিয়ে , বিভিন্ন ক্ষীণ বিচ্ছিন্ন আন্দোলনের ধারাগুলিকে একটি জোরদার স্রোতে সমন্বয় করার লক্ষ্য নিয়ে। এই সমিতির প্রথম সফল সভা অনুষ্ঠিত হয় ২ জুন '৮৬।এই সভায় সংখ্যালঘু যুব মোর্চা, জাতিয়তাবাদী সংঘর্ষ সমিতি, গনতান্ত্রিক ছাত্র যুব সংগ্রাম সমিতি, এআইডিএসও, ছাত্র যুব সংগ্রাম কমিটি ইত্যাদি সংগঠন উপস্থিত ছিলেন। তারপর থেকেই দ্রুত করিমগঞ্জ ও হাইলাকান্দি জেলায় সমিতির শাখা সংগঠনগুলো গড়ে উঠতে থাকে। একে একে শিক্ষা সংরক্ষণ সমিতি, ইউ এম এফ, ভাষা শিক্ষা সংগ্রাম সমিতি, করিমগঞ্জ যুব সংগ্রাম সমিতি, হাইলাকান্দি পরিকল্পনা রূপায়ন কমিটি ইত্যাদি সংগঠন গুলো সংগ্রাম সমন্বয় সমিতির মূল স্রোতে এসে মিশে যায়। গড়ে উঠে গোটা উপত্যকা ব্যাপী সংগ্রামের ভূমি। ১৩ জুন থেকে ১৯ জুন গন জাগরণ সপ্তাহ পালন করা হয়। ২৬শে জুন থেকে ২৮শে জুন ডিসি, স্কুল পরিদর্শক, সেলস্ ট্যাক্স ইত্যাদি অফিসে বিক্ষোভ দেখানো হয়। স্কুল কলেজের ছাত্র ছাত্রীরা ক্লাস বর্জন করে পিকেটিং এ যোগ দেয়। করিমগঞ্জে ৮ জন মহিলা সহ ৫৪ জনগ্রেপ্তার হন। প্রাক্তন ডেপুটি স্পিকার ও ৬১' র ভাষা সংগ্রামী রথীন্দ্রনাথ সেন, ৬১' র ভাষা সংগ্রামী ননীগোপাল স্বামী, সতু রায়, ইন্দ্রজিৎ দাস, প্রাক্তন এম পি সুদর্শন দাস, রথীন্দ্র ভট্টাচার্য, মানবেন্দ্র দত্ত চৌধুরী, কামাল উদ্দিন আহমেদ, প্রাক্তন বিধায়ক কেতকী প্রসাদ দত্ত, ছাত্র নেতা সজল দত্ত, অজয় ভট্টাচার্য প্রমুখ এ কারাবরণকারী দের মধ্যে উল্লেখযোগ্য। সংগ্রাম সমন্বয় সমিতির অধীনে বিভিন্ন ছাত্র যুব সংগঠন সকল স্কুল ও কলেজে আন্দোলনের পরিবেশ গড়ে তুলে। গ্রামের স্কুলগুলিও সামিল হয়। শুরু হয় উপত্যকা জুড়ে বিক্ষোভ। ক্লাস বয়কট, অফিস পিকেটিং, সভা, পথসভা, অবস্থান, মশাল মিছিল ইত্যাদির মাধ্যমে প্রতিবাদ পূর্ণরূপ পেতে শুরু করে।

১১জুলাই শুরু হয় আইন অমান্য আন্দোলন। করিমগঞ্জের উপাযুক্ত অফিসের প্রধান ফাটক দিয়ে ভাষা সার্কুলার প্রত্যাহারের শ্লোগান দিতে দিতে বিক্ষোভকারীরা প্রবেশ করতে চাইলে সশস্ত্র পুলিশ তা প্রতিহত করতে লাঠিচার্জ করে। আহত হন ১৭ জন ছাত্র ছাত্রী। গ্রেপ্তার হন ৫ জন ছাত্রী সহ ২৪ জন। আহত হন সীমা দাস ( পরবর্তীতে শহিদ দিব্যেন্দু দাসের ভগ্নী,নবম শ্রেণির ছাত্রী) গুরুতর আহত অবস্থায় ছাত্র নেতা অজয় ভট্টাচার্য ও গৌতম দত্ত পুরকায়স্থ কে হাসপাতালে পাঠানো হয়। অনেককে বিনা চিকিৎসায় আটকে রাখা হয় বিভিন্ন মামলায়। জেলার সেশ্যান জাজ্ কোর্টের কেস রেকর্ড থেকে জানা যায় GR case no. 771/86 তে ১১-৭-'৮৬ এর আইন অমান্য কারীদের এবং ২১-৭-'৮৬ এর বিক্ষোভকারীদের section 147,148,333,427 IPC তে আটক করা হয়েছিল। এদের মধ্যে ছিলেন সংগ্রাম সমন্বয় সমিতির করিমগঞ্জ শাখার বনবীর চৌধুরী, অজয় ভট্টাচার্য, রজত চক্রবর্তী, বিশ্বজিৎ দাস, তাপস চক্রবর্তী, সঞ্জয় রায়, বিজিত কুমার দাস, সুদীপ পাল, মুকুল চৌধুরী, সুজিত দাস, অমর রায়, শঙ্কর বনিক, অপু চন্দ, তুষার দাস, গীতেশ রঞ্জন ভট্টাচার্য, সজল দত্ত ও আরো ৫০ জন বিক্ষোভকারী। ১১ জুলাই দুপুরেই সংগ্রাম সমিতির ডাকে স্থানীয় গঙ্গা ভান্ডারের সামনে ছাত্র নেতা মিশন রঞ্জন দাসের সভাপতিত্বে আইন অমান্যকারীদের উপর শারীরিক নির্যাতন ও গ্রেপ্তারির প্রতিবাদ জানানো হয় এবং বন্দিদের নিঃশর্ত মুক্তির দাবিতে বক্তব্য রাখেন অধ্যাপক ডঃ কামাল উদ্দিন আহমেদ (ইউ এম এফ), সতু রায় (কংগ্রেস- ই) , শরদিন্দু দাস(ডি এস ও),শ্যামা পাল ( আই এস ইউ) ও পিন্টু দত্ত প্রমুখ নেতৃবৃন্দ।

১২ জুলাই স্থানীয় শম্ভুসাগর পার্কে লাঠিচার্জ ও গ্রেফতারীর প্রতিবাদে একটি বিস্তৃত জনসভার আয়োজন করা হয়। এই সভা থেকেই সজল দত্ত,ভাষা শিক্ষা সংগ্রাম সমিতির সভাপতি রজত চক্রবর্তী প্রমুখ নেতাদের গ্রেপ্তার করা হয়।এই সভায় নিঃশর্ত বন্দি মুক্তি ও পুলিশি জুলুমের তদন্ত দাবি করে জেলাধিপতি সুভাষ দাসের কাছে স্মারকলিপি দেয়া হয়।

১৪ জুলাই আকসার ডাকে বরাক বন্ধ পালিত হয় ভাষা সার্কুলার প্রত্যাহার ও কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের দাবিতে। করিমগঞ্জ থেকে গ্রেফতার হন ৩৪ জন। তাদের পরে ছেড়ে দেওয়া হয়। পিকেটিং রত আকসা জেলা কমিটির আহ্বায়ক বলরাম দে লাঠিচার্জে আহত হন। আহত হয়ে হাসপাতালে যান খগেন দাস নামে একজন ঠেলাকর্মী।

**বন্দিমুক্তির দাবিতে জেলা ভরো আন্দোলন**

-----------------------------------

সেবার ভাষা সার্কুলার প্রত্যাহার, বরাক উপত্যকায় কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন এবং বন্দিমুক্তির দাবিতে প্রবীন জননেতা যজ্ঞেশ্বর দাসের নেতৃত্বে ১৫ জুলাই অসংখ্য ছাত্র যুব এবং মহিলাদের এক মিছিল পুলিশ বেষ্টনী ভেদ করে , ১৪৪ ধারা অমান্য করে করিমগঞ্জের উপাযুক্ত অফিসের সংলগ্ন এলাকায় প্রবেশের চেষ্টা করে। পুলিশ গতিরোধ করে এবং পর্যায়ক্রমে তিন শতাধিক আন্দোলনকারীকে গ্রেপ্তার করে অস্থায়ী কারাগারে আটকে রাখে। পরে সন্ধ্যায় তাদের ছেড়ে দেয়। কারাবরণ কারীদের মধ্যে ছিলেন যজ্ঞেশ্বর দাস, ডঃ কামাল উদ্দিন আহমেদ, সতু রায়, অধ্যাপিকা মন্দিরা নন্দী, কেতকী প্রসাদ দত্ত, মনোজোতি চক্রবর্তী প্রমুখ। স্থানীয় রমনীমোহন হলে ১৫ জুলাই অনুষ্ঠিতব্য ত্রিপুরার শিল্পীদের নিয়ে জাতীয় সংহতির উপর একটি অনুষ্ঠান বন্দীমুক্তির দাবিতে বাতিল করে দেওয়া হয়। ১৭ জুলাই বেলা ৪ টা থেকে পরদিন ভোর ৬ টা অব্দি রাজনৈতিক বন্দি হিসেবে স্বীকৃতির দাবিতে জেলে ও হাসপাতালে আটক ছাত্র যুবারা অনশন ধর্মঘট পালন করেন কারন তাদের চোর ডাকাতের সাথে সাধারণ কয়েদী হিসেবে আটকে রাখা হয়েছিল সঙ্গে চলছিল নানারকমের বঞ্চনা ও অত্যাচার। ১৮ জুলাই বদরপুরের হোটেল সোনিতে সংগ্রাম সমন্বয় সমিতির অন্যতম আহ্বায়ক মিশন রঞ্জন দাসের সভাপতিত্বে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় প্রস্তাব নেওয়া হয় যে ২১শে জুলাই মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্ল মোহান্তের করিমগঞ্জ আসাকে কেন্দ্র করে ভাষা সার্কুলার প্রত্যাহার ও বন্দিমুক্তির দাবিতে স্থানীয় আবর্ত গৃহের সম্মুখস্থ মাঠে বিক্ষোভ সমাবেশ হবে, বরাক বন্ধ পালিত হবে এবং মুখ্যমন্ত্রীর সব অনুষ্ঠান বয়কট করা হবে।

**বন্দি মুক্তি না হলে আলোচনা নয়**

-----------------------------------

আসামের তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রী বৃন্দাবন গোস্বামী স্থানীয় প্রশাসন মারফত একটি আপোষ প্রস্তাব পাঠান। বলা হয় সব আন্দোলনকারী সংগঠন থেকে দু'জন করে নেতাকে নিয়ে তিনি ২০শে জুলাই একটি আলোচনায় বসতে চান , সমস্যার সমাধান সূত্র বের করতে। সংগ্রাম সমন্বয় সমিতির সিদ্ধান্ত হয় "না, যতক্ষণ না বন্দিদের নিঃশর্ত মুক্তি দেওয়া হচ্ছে ততক্ষণ কোন আলোচনায় বসা হবে না।" এই সিদ্ধান্তের কথা প্রশাসনকে জানিয়েও দেওয়া হয়।

**২১শে জুলাই, রক্তের আলপনায় আঁকা অ আ ক খ**

-----------------------------------

১৯৬১ - কবিগুরুর জন্ম শতবর্ষকে বরাকের বাঙালিরা বরণ করেছিল ১১ শহীদের রক্ত অর্ঘ্য দিয়ে। বিশ্বকবির জন্মজয়ন্তীতে বিশ্বের কোথাও বাঙালিদের এই সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্য হয়নি যে কবির মাতৃভাষাকে এমন রক্ত মূল্যে রক্ষা করতে হয়েছিল। ১৯৮৬ - তার একশো পঁচিশতম বর্ষপূর্তি, বরাকের বাঙালিদের ভাগ্যে সেই একই তর্পন বিধি। এবারে ১৯শে মে নয় ২১শে জুলাই। বিশ্বের প্রথম বাংলা ভাষা সংগ্রামের সাথে সংখ্যাবাচক মিল ঘটনাচক্রে হয়ে গেলেও এই ২১শে সেই ২১শে ফেব্রুয়ারি নয় নিজের দেশেরই ভিতরে ভাগ্য বিড়ম্বিত পরদেশি হয়ে থাকা বাঙালিদের নিয়তির কঠিন করুণ পরিহাস থেকে যার জন্ম , এক এক উগ্র জাতীয়তাবাদের ঔরসে।

**স্থান করিমগঞ্জ ...**

-----------------------------------

ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী আসাম রাজ্যের অন্তর্গত ,একটি অনুন্নত অবহেলিত জেলা শহর। মুখ্যমন্ত্রী মাইজডিহির বি এস এফ হেলিপ্যাডে এসে অবতরণ করলেন ন'টা নাগাদ। বিশেষ নিরাপত্তা সহকারে তাকে নিয়ে আসা হল মহকুমা পরিষদের রাস্তা দিয়ে সার্কিট হাউসে। তাঁর প্রবেশপথে কোথাও কোন বিক্ষোভকারী ছিলেন না। আশেপাশের বাড়ি থেকে উড্ডীয়মান কালো পতাকা পুলিশ আগেই নামিয়ে ফেলেছিল। ফলতঃ শ্রী প্রফুল্ল মোহান্ত প্রফুল্ল চিত্তেই সার্কিট হাউসে এসে পৌঁছতে পারলেন। বরাক উপত্যকা সংগ্রাম সমন্বয় সমিতির ডাকে যে বিক্ষোভ কর্মসূচি নেওয়া হয়েছিল তা শুরু হবার কথা ছিল মুখ্যমন্ত্রী এসে পৌঁছবার পর থেকে। এবার দলে দলে ছাত্র যুব বিক্ষোভকারী রা আসতে শুরু করলো। জমায়েত হল মেইন রোড ও ট্রেজারির রাস্তার সংযোগ স্থলে, পুলিশ ওদের গতি রুখে ওখানেই আটকে রেখে ছিল। ওরা শ্লোগান দিচ্ছিল "গো ব্যাক প্রফুল্ল মোহান্ত, প্রফুল্ল মোহান্ত ফিরে যাও," , "বাংলা ভাষা ফিরিয়ে দাও, নইলে তুমি চলে যাও" , "ভাষা সার্কুলার মানছি না,মানব না" ইত্যাদি। সবার হাতেই কালো পতাকা, বুকে কালো ব্যাজ, মুখ্যমন্ত্রীর অবস্থানস্থল অর্থাৎ সার্কিট হাউসটি অকুস্থল থেকে অন্তত চারশ মিটার দুরে। বিক্ষোভ ছিল সম্পুর্নতঃ শান্তিপূর্ণ ও অহিংস বিক্ষোভ। তবু করা হলো লাঠিচার্জ। বাড়লো উত্তেজনা, দাঁড়িয়ে থাকা দর্শকদের মধ্যে রেডক্রস প্রান্তে ছিল বেশ কিছু লোক। পুলিশ সেখানে গিয়েও লাঠিচার্জ করে, ফলে ওঁরাও বিক্ষোভকারীতে পরিনত হয়। মেয়েদের লক্ষ্য করে পুলিশ কুৎসিত অঙ্গভঙ্গি করে, ফলে সেই ক্ষোভ ছেলেদের মধ্যেও সঞ্চারিত হয়। কয়েকটি ছেলে পুলিশ কে লক্ষ্য করে ঢিল ছুড়তে শুরু করে। এদের উত্তেজনা বাড়ার সাথে সাথে হুড়হুড় করে বাড়তে থাকে বিক্ষোভকারীদের সংখ্যা। উত্তেজনার বাঁধ ভেঙে যাচ্ছে দেখে আন্দোলনকারী নেতারা ঝাঁপিয়ে পড়ে অতিকষ্টে বিক্ষোভকারী ও বিক্ষোভ সমর্থকদের নিয়ন্ত্রণ করেন। ঠিক সেই সময় বলা নেই কওয়া নেই শুরু হয়ে যায় গুলিবর্ষণ। কোনরকম সাবধান না করে, কাঁদানো গ্যাস প্রয়োগ বা ব্লাঙ্ক ফায়ারিং না করে। গুলিবর্ষণ শুরু হয় দুটো প্রান্তেই, মেইন রোডের বিক্ষোভকারী দল এবং রেডক্রস রাস্তার বিক্ষোভকারীতে পরিনত হওয়া দর্শকদের দিকে। মাতৃভাষার বেদিমূলে রক্ত তর্পন করে ঝরে পড়ল দুটি তরুণ প্রাণ - দিব্যেন্দু দাস (যীশু) ও জগন্নায় দেব (জগন)। আসাম সরকারের পুলিশ বাহিনী যে কতটা রক্ত হোলির নেতায় মত্ত হয়েছিল তার প্রমাণ কোর্ট বিল্ডিং এর দিকেও গুলি বর্ষন, যেখানে কোন বিক্ষোভকারী দল ছিলনা। ঐ অফিসের ভিতর গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা

গেলেন গুরুপদ দাস, যিনি ফৌজদারি কর্মচারী ছিলেন। আহত হলেন একজন মহিলা সহ আরো পাঁচজন সরকারি কর্মচারী, যারা ব্যাস্ত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রীর এই আগমন অনুষ্ঠানের ডিউটিতে।

যে দুটো রাজপথে গুলিবর্ষণ হয়, সেখানে কালো পিচের উপর গরম রক্তের স্রোত তখন বাংলা ভাষার অক্ষরে আলপনা তৈরি করছে। যীশুর মাথার খুলি উড়ে গেছে। তাঁর দেহটি পুলিশ জীপে করে থানার টিলায় চ্যাংদোলা করে তোলে। ২৪ ঘন্টা শহিদ শব পড়ে ছিল থানার মেঝেতে। ওর আত্মীয়দের খবর দেবার প্রয়োজন বোধ করেনি প্রশাসন। বরং তার পনের বছর বয়সী ছোট বোনটি যখন পাগলের মতো ছুটতে ছুটতে থানার গেটে পৌঁছাল, তখন পুলিশের উদ্ধত রাইফেল ও অকথ্য গালিগালাজের তাড়া খেয়ে পালাতে হলো তাঁকে। বেয়নেট সোজা মেয়েটির বুকের উপর ধরে মোহান্ত সরকারের পুলিশ অসমীয়াতেই বলে 'ইয়ার পরা গুচি যা,মারি পেলাম'। জগন্ময়ের মৃতদেহটিরও একই হাল হতো যদিনা শ্রীমতী লোপামুদ্রা চৌধুরী তখন ঘটনাস্থলে এসে পৌছাতেন। জগনের ছোটভাই ও শ্রীমতি চৌধুরী এই শহিদ শব তুলে নিয়ে যান। একটি গুলি সরাসরি জগন্ময়ের চোখ ভেদ করে গেছে। গুলিবিদ্ধ ও আহত রক্তাক্ত আরো ৫০জন লোক রাজপথে যন্ত্রনায় কাতরাচ্ছে, কিন্তু তাদের হাসপাতালে পৌঁছে দেবার কোন ব্যাবস্থা নেই। এদের হাসপাতালে পৌঁছে দেবার মহৎ ভুমিকাটি সেদিন পালন করেছিলেন রেডক্রস সোসাইটি। শ্রী অসিত বরণ চক্রবর্তী রেডক্রসের একটি ভ্যান নিয়ে এবং অধ্যাপক সুশান্ত কৃষ্ণ দাসকে সঙ্গে নিয়ে এই কাজে এগিয়ে এসেছিলেন। শিক্ষিকা লোপামুদ্রা চৌধুরী অসম সাহসিকতায় রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে দুহাত তুলে পুলিশের একটি 'ম্যাটাডোর' থামালেন। পুলিশ দের টেনে নামাবার চেষ্টা করলেন - গাড়ি খালি করে দাও আমাদের ছেলেরা হাসপাতালে যাবে। পুলিশ তেড়ে এলেও কিছু করতে পারেনি। এস পি খগেন শর্মা তার প্রভু কর্তব্য সেরে অর্থাৎ মুখ্যমন্ত্রীকে গন্তব্যে পৌঁছে দিয়ে ফেরার পথে এখানে এসে পড়েছিলেন, তিনি পুলিশদের ক্ষান্ত করে গাড়িটি ছেড়ে দিতে বললেন। শ্রীমতি চৌধুরী ও রেডক্রস সোসাইটি যদি তখন ঘটনাস্থলে এসে না পৌঁছে না যেতেন তবে গুলিবিদ্ধ মৃতের সংখ্যা আরো বেড়ে যেত সন্দেহ নেই। আহতদের হাসপাতালে নিয়ে যাবার কাজে রেডক্রস সোসাইটিকে সাহায্য করতে এগিয়ে এসেছিলেন আরেকজন, তিনি ৬৩ বছরের দুঃসাহসী বৃদ্ধ, স্থানীয় জনতা দলের সভাপতি, শ্রী হিমাংশু শেখর দাস(দোলাদা), যিনি ঐদিনই পরে পুলিশের লাঠ্যৌষধি খেয়ে নিজেই আবার হাসপাতালে ভর্তি হতে বাধ্য হয়েছিলেন।

গুলিবর্ষণের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই মুখ্যমন্ত্রী মোহান্ত ফকিরা বাজারের উদ্দেশ্যে করিমগঞ্জ ত্যাগ করেন। স্বাধীন ভারতের মুখ্যমন্ত্রীদের মধ্যে আসামের এই মুখ্যমন্ত্রীই বোধহয় প্রথম যিনি সরজমিনে নিরাপদ দূরত্বে বসে নিজের চোখে নিজের পুলিশ বাহিনীর বীরত্ব লীলা প্রত্যক্ষ করলেন। যেন তিনি এসেছিলেন এমন এক অভিনব 'গার্ড অব অনার' প্রত্যক্ষ করার জন্যেই। নইলে টিলার উপরে বিক্ষোভ স্থল থেকে নিরাপদ দূরত্বে, সুরক্ষা বাহিনী আবৃত মুখ্যমন্ত্রীর এমনকি নিরাপত্তার সমস্যা হয়েছিল যে বিক্ষোভকারীদের গুলি করেই দমন করতে হবে ! তাঁর আগমন নির্গমনের পথও ছিল নীরব বিক্ষোভ মুক্ত। অত্যন্ত আশ্চর্যজনক বিষয় হলো মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে সঙ্গে তার গন্তব্যের দিকে রওয়ানা হলেন করিমগঞ্জের সব দায়িত্বপূর্ণ অফিসার গন, গোটা শহরটাকেই প্রশাসনহীন করে রেখে। পেট্রোল পাম্পের মতো গুরুত্বপূর্ণ স্থানে রাখা হলো গোটা কয়েক লাঠিধারী পুলিশ। এদের মধ্যে তিনজন শিকার হলো বিক্ষুব্ধ জনতার নৃশংস নিধনের। ঐ তিনজনই আসাম স্টেট রিজার্ভ ফোর্সের। তবে এই নিধন যজ্ঞে বিশেষ কোন চক্রের হাত ছিল বলেই অনেকে মনে করেন।

গুলি চালনার প্রতিবাদে শহরের বিভিন্ন স্থানের জনগনকে ঘর ছেড়ে রাস্তায় নেমে পড়তে দেখা যায়। শিলচর রোডে শহরের উপকণ্ঠে কার্ফু ঘোষণা অব্দি জড় হয় প্রায় হাজার খানেক লোক। হাসপাতাল থেকে গুরুতর আহতদের নিয়ে শ্রী অসিত বরণ চক্রবর্তী যখন ঐ পথে শিলচর মেডিক্যাল কলেজের দিকে রওয়ানা হন, তখন নাকি শ'খানেক এটিএফের সাথে সংঘর্ষ বাঁধে বাঁধে এমনটা দেখে গেছিলেন।সেলাইন দেওয়া অবস্থায় রোগীদের নিয়ে যেতে সঙ্গে কোন ডাক্তার যেতে রাজি হননি। হাসপাতালের কম্পাউন্ডার শ্রী বিষ্ণু দাস (যতন) বাবুকে ওরা সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন।

Ekhankotha

**কার্ফু ও পুলিশি তান্ডব**

-----------------------------------

এদিকে সরকারি অফিস ছিল খোলা। সরকারি উচ্চমাধ্যমিক স্কুলে ছিল শিক্ষক শিক্ষিকাদের ট্রেনিং ক্লাস। গুলি বর্ষন হয়েছিল ঐ স্কুলেরই পাশে। সময়টা ছিল অফিস শুরু হওয়ার সময়। কেউ পৌঁছেছেন , কেউ তখনো রাস্তায়। গুলিবর্ষণের খবর পেয়ে বিক্ষোভকারীদের আত্মীয় স্বজনরা ছুটেন ঘটনাস্থলের দিকে। পুলিশ তাদের বাধা দেয়। উত্তেজিত করে তোলে। হাসপাতালেও জনতার ঢল, হই হট্টগোল। এরিমধ্যে এফ এল এস যোগে বেলা ১২টায় ঘোষণা করা হল কার্ফু। ফলে কেউ শুনেছেন কেউ শুনেননি। অফিস আদালত থেকে কর্মচারীদের বাড়ি ফেরার স্রোত বইতে থাকে। অনেকেই বাধাপ্রাপ্ত হন। লাঠিচার্জ ও চলে, গুলির আওয়াজ ও শোনা যায়। সে এক অরাজক অবস্থা। প্রশাসন যেন উবে গেছে। সরকারি তরফে জানানো হয় অফিস আদালতের কাগজপত্র পোড়ানো হয়েছে, তিনটি জিপে আগুন দেওয়া হয়েছে, ডাকবাংলোও পোড়ানো হয়েছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ডাকবাংলো ছিল অক্ষত। কাগজ বা জিপ পোড়ানোর খবরও সন্দেহজনক। হঠাৎ করে কার্ফু ঘোষনায় ও পুলিশি সন্ত্রাসের ফলে বহু লোক বহু জায়গায় আটকে পড়ে যান। অসিত চক্রবর্তীরা রাতে শিলচর থেকে ফিরে রেডক্রসের গাড়ি করে ডি সি র বিশেষ অনুমতি নিয়ে রেডক্রস হাসপাতালে আটকে পড়া বেশ কিছু লোককে বাড়ি বাড়ি পৌঁছে দেন বলে জানা যায়। কার্ফুর খবর সর্বত্র প্রচারিত হতে পারেনি, সর্বত্র এফ এল এস না থাকায় বা অধিকাংশ মাইকই নষ্ট থাকায়। ফলতঃ শহর থেকে বেড়িয়ে পড়া লোকজনকে পড়তে হয় মহা ভোগান্তিতে। কারো হাড়গোড় ভেঙ্গেছে, কারো ফেটেছে মাথা, আসাম সরকারের গুন্ডা পুলিশ বাহিনীর অত্যাচারে। যারা আহতদের শুশ্রূষা ও হাসপাতালের আশ্রয়ে পোঁছানোর কাজে ব্যাস্ত ছিলেন তাদের মধ্যেও কয়েকজনকে পড়তে হয় এই অত্যাচারের কবলে। শ্রী হিমাংশু শেখর দাসের অবস্থাও হয়েছিল তাই। পুলিশি উন্মাদনার এ এক জ্বলন্ত প্রমাণ।

কার্ফু চলে একনাগাড়ে ৪৮ ঘন্টা। এমন বিরামহীন কার্ফু কি এদেশের কোথাও হয়েছে ? ২৩শে জুলাই মাত্র দু'ঘণ্টার জন্যে অর্থাৎ বারটা থেকে দুটো অব্দি প্রথম কার্ফু শিথিল করা হয়। তারপর ২৪শে জুলাই থেকে ক্রমান্বয়ে ৪, ৬, ৯ ও ১২ ঘন্টার জন্য শিথিল করা হয় এবং ২৮শে জুলাই থেকে ভোর ৫টা থেকে রাত ৯টা অব্দি শিথিল থাকে। ২১শে জুলাই হাসপাতালের রোগিদেরে খিঁচুড়ি খাওয়ানো হয়। পরের দু'দিন খাবারের কোন ব্যবস্থাই ছিলো না, উপোস থাকতে হয় রোগীদের। আসাম সরকার যেন মাতৃভাষার অধিকার প্রার্থীদের পাপ স্খালনের ব্রত করিয়ে নেন বিনা নোটিশে। ভাবতে লজ্জা হয় আমরা স্বাধীন দেশের অধিবাসী। জানি না এমন ঘটনা আর কোথাও ঘটেছে কি-না। এই ২১শের রাত থেকেই গোটা শহর জুড়ে শুরু হয়ে যায় তল্লাশির নামে পুলিশি সন্ত্রাস। বিভীষিকাময় রাত এড়াতে শহরের অধিকাংশ ছাত্র যুবককে শহর ছেড়ে গোপন পথে পাড়ি দিতে হয় নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে। নির্দোষ নিরপরাধ ছাত্র যুবক অভিভাবকদের যখন তখন ভেনে করে তুলে নিয়ে যায় পুলিশ। থানায় ভাষা-সংগ্রামীদের উপর যে অত্যাচার হতো আকাশে বাতাসে ছড়িয়ে পড়ত যে আর্তনাদ, তাতে অসহায়ভাবে বিনিদ্র রজনী কাটাতেন আশপাশের এলাকার মানুষ। বিনিদ্র রজনী কাটাতে হতো গোটা শহর ও শহরতলির সব গৃহেই। চুপ করে পড়ে থাকতে হতো, কথা বললেই পুলিশ এসে কড়া নাড়বে। কবির সংবেদনে ব্যাপারটি ছিল এরকম :-

এই চুপ চুপ কথাটি বন্ধ কর ।
এই চুপ চুপ কান্না বন্ধ কর ।
ওদের জন্যে দু'চোখ ভরে ?

ঝরুক, বুক চেপে সহ্য কর ।
একটু হলেই শুনে ফেলবে ,
খট্ খট্ খট্  কার্ফুমাটি থর্ থর্ থর্ থর্ ।
যীশুর ঘিলু ছিন্নভিন্ন,জগন রক্ত ধড় ।
এই চুপ চুপ কপাট বন্ধ কর ।
এই চুপ চুপ কান্না বন্ধ কর ।
বুলেট লাথি তোর দাদাদের ভেঙেছে পাঁজর ,
পায়ে-নখে শাল বিঁধিয়ে প্রতিহিংসার পর ,
হিসি দিয়ে বলে তেষ্টায় ' 'খা ভাষাখা মর' ।
এই চুপ চুপ কপাট বন্ধ কর।
এই চুপ চুপ কপাট বন্ধ কর।

**গ্রেপ্তার ও সন্ত্রাস ...**

-----------------------------------
সমন্বয় সমিতির অফিস ভেঙ্গে দেয়া হয়। রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দও পুলিশের অত্যাচার থেকে রেহাই পান নি। সব নেতাদের ধরে নিয়ে গিয়ে প্রহার করা হয় ও কারারুদ্ধ করা হয়। তাদের মধ্যে ছিলেন মার্কসবাদী ফরোওয়ার্ড ব্লকের দেবদাস রায়, বিজেপি'র হরিপদ দেব ও রথিন্দ্র ভট্টাচার্য্য। মহকুমা পরিষদের প্রাক্তন মুখ্য শাসক ও কংগ্রেস-ই নেতা মাধবেন্দ্র দত্ত চৌধুরীকে অসুস্থ অবস্থায় ধরে নিয়ে গিয়ে দু'দিন থানার বারান্দায় রাখা হয়। অত্যাচারিত হতে হয় তাঁকেও। বৃদ্ধ অবসরপ্রাপ্ত রেলকর্মচারি সুবিনয় দেবকে স্টেটব্যাংকের সামনে থেকে ধরে নিয়ে যায় পুলিশ, প্রহৃত হতে হয় তাঁকেও। সামসুল হক ও আব্দুল হান্নানকেও আহত অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়। রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ও আন্দোলনকারী নেতার কেউ কেউ ২১শে জুলাই-র দিন থেকেই আত্মগোপন করে গ্রেপ্তার এড়াতে চেষ্টা করেন। পর পর স্থান পাল্টিয়ে পাল্টিয়ে বেড়াতে হয় তাদের। আস্তানার গন্ধ শুঁকে শুঁকে ছুটতে থাকে পুলিশ।

২১শের ঘটনায় পুলিশ কেস সাজিয়ে ছিল মুলতঃ ৪টি।

(১)চরবাজার থানা লুঠ মামলা

(২)ডি.সি.অফিসে অগ্নিসংযোগ, গাড়ী জ্বালানো,ডাকবাংলো জ্বালানো মামলা

(৩)পুলিশদেরে ইট পাটকেল নিক্ষেপ করে ঘায়েল করা মামলা এবং

(৪)পেট্রল পাম্পে পুলিশ-হত্যা মামলা।

(C)Ishan Kotha

কংগ্রেস-আই নেতা প্রাক্তন এম.পি তথা ৬১-র অন্যতম প্রধান ভাষা সংগ্রামী নৃপতি রঞ্জন চৌধুরী, ছাত্র নেতা অজয় ভট্টাচার্য্য ও ইউএমএফ নেতা ড.কামাল উদ্দিন আহমেদকে গ্রেপ্তার করা হয় এই (২)নং মামলার আসামী হিসেবে। অনবরত আত্মগোপনের ঠিকানা পাল্টাতে পাল্টাতে ক্লান্ত পরিশেষে বাড়ী ফিরে আসেন ড.কামাল উদ্দিন আহমেদ। তারপর শিলচর আকাশবাণীতে একটি অনুষ্ঠান করতে যাবার পথে তাঁকে বাসস্ট্যান্ড থেকে ধরে থানায় নিয়ে যাওয়া হয়। পূর্বে তাঁর বাড়ীতে খানাতল্লাশির নামে জিনিষপত্র তছনছ করা হয় কয়েকবার। প্রথমে শ্রী রথীন্দ্র ভট্টাচার্যকেও এই মামলায় অভিযুক্ত করা হয়, পরে কেস জমছে না দেখে তাঁকে নিয়ে নেওয়া হয় চরবাজার থানা লুঠ মামলার এক্তিয়ারে। Murder case under section 302 and 149 ধারায় অভিযুক্ত করা হয় নীতু রায়, রতন চৌধুরী, বাদল সূত্রধর, নির্মল পাল, প্রাণবল্লভ পাল, অতীশ রায়, দেবু মজুমদার, বাচ্চু সাহা, দ্বিজেন্দ্র ভৌমিক, কাজল দে ও আরও অনেককে। কিন্তু অভিযোগ পরীক্ষা কালেই জজসাহেব ওঁদের বেকসুর খালাস করে দেন। গুলিবিদ্ধ হয়ে যাঁরা আহত হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে চারজনের অবস্থা ছিল গুরুতর। এঁরা হলেন জুডিশিয়াল ম্যাজিসেট্রট অফিসের কর্মচারী অধীর দেব, বাড়ী মহিশাসন, বয়স ৩৬, বুকে গুলিবিদ্ধ হয়েছিলেন। চিফ্ ম্যাডিকেল ও হেল্থ্ অফিসের ভ্যান-ড্রাইভার মহেন্দ্র কর বয়স ৩৮, মাথায় গুলিবিদ্ধ হয়েছিলেন। মহকুমা পরিষদের পাশের চা স্টলের মালিক দেবব্রত চক্রবর্তী, বাড়ি কালীমহাবীর রোড, বয়স ৪২ মেরুদণ্ডে গুলিবিদ্ধ হয়েছিলেন।

অন্যান্য গুলিবিদ্ধরা হলেন:- শ্যামল রায়(২৬) পায়ে গুলির আঘাত । দীপক চৌধুরী(১৮), সুভাষনগর, পায়ে গুলির আঘাত।

গুলিবিদ্ধ হয়ে করিমগঞ্জ হাসপাতালে আসেন :- স্বপন বণিক(২৫), দেবাশিষ রায় (১৮), পার্থ সারথী দাস(৩০) ও সামছুল হক (২৬)।

ডিস্ট্রিক্ট ফরেষ্ট অফিসের কর্মচারী নগেন্দ্র পালকে(৪৮) গুরুতর আহত অবস্থায় শিলচর মেডিক্যাল কলেজে নিয়ে যাওয়া হয়। তার উপর পুলিশ অকথ্য শারীরিক নিগ্রহ চালিয়েছিল।

গ্রেপ্তার করে নিয়ে শারীরিক অত্যাচারে অসুস্থ করে হাসপাতালে পাঠানো হয়েছিল যাঁদের, পুর্বউল্লিখিতদের ছাড়া তাঁদের মধ্যে ছিলেন :-অনুপ ভট্টাচার্য(২৩), সুভাষনগর; পিযুষ কান্তি কর(২৬), ই এন্ড ডি কলোনি; সুনীল সুত্রধর (২৮), চরবাজার; বকুল রায়(২৩), নীলমনি রোড; দুলাল বনিক (২৬), লক্ষ্মীবাজার রোড; অমিত ভট্টাচার্য (২৩), লঙ্গাই রোড; মোহিত পুরকায়স্থ (২৮), শ্যামাপ্রসাদ রোড; শৈলেন দাস(২৭), বিপিন পাল রোড; রবিজিৎ দাস(২০), নেতাজী পল্লী রোড; অশ্বিনী নমঃসুদ্র (২৭), রেলকলোনী ও সুবিন কুমার দে(৬৩), রামকৃষ্ণ মিশন রোড। এদের মধ্যে কারো কারো শারীরিক আঘাত আজও সেরে উঠেনি যেমন শৈলেন দাস এই সেদিন তার আঘাত বিকৃত হয়ে পড়া হাতের আঙ্গুল ও পা দেখিয়ে বললেন 'এই যে দেখুন দাদা, বাঙালি হবার অভিশাপ আজও বয়ে বেড়াচ্ছি।'

সব মিলিয়ে ২১শে জুলাইর ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে গ্রেপ্তার করে বিভিন্ন মামলায় যে ৮৯ জনকে কারাগারে নিক্ষিপ্ত করা হয় তাদের নাম নীচে দেওয়া হল –

গোপাল চক্রবর্তী, যতন কিশোর পাল, সুভাষ রঞ্জন দে, সুনীল মালাকার, দেবপ্রসাদ চৌধুরী, মইনুদ্দিন তালুকদার, সমর কুমার দাস, ফরিজউদ্দিন, ইসমাইল আলি, মইনুদ্দিন, অমর দাস, সুশি বিশ্বাস, মোহাম্মদ আবদুল, শ্রীমতি সন্ধ্যা দাস, শ্রীদাম শীল, বিপুল নাথ, নন্দ চক্রবর্তী, নরেশ মালাকার, মনিরাজ দাস, দানজিৎ কুমার দাস, সুবিনয় দত্ত, হরিচরণ দেবনাথ, মাধব চন্দ্র পাল, কাঁলাচাদ পাল, রঞ্জিত পাল, জীবন কৃষ্ণ পাল, সঞ্জিত কুমার পাল, হরিপদ দেব, রথীন্দ্র ভট্টাচার্য, সুবিনয় কুমার দে, পথিক দাস, পটন পাল, তরুণ দাস, কাজল সূত্রধর, দ্বিজেন সাহা, সুবীর কুমার সাহা, প্রদীপ গোপন, গৌতম গোপন, ননি চন্দ্র দে, শঙ্কর রায়, অভিজিৎ চন্দ্র, পান্নালাল সেন, মানিক রায়, সুদীপ রায়, তাপস শঙ্কর দে, পার্থ ভৌমিক, চম্পক কুমার পাল, মৃন্ময় ভট্টাচার্য, বীরময় নাথ, কীর্তি নাথ, মনিকান্ত দাস, মানবেন্দ্র দত্ত চৌধুরী, দেবদাস রায়, ইন্দ্রজিৎ পাল, রত্ন বনিক, ভক্ত পাল, অলক দত্ত, আব্দুল গফুর, প্রাণভল্লভ পাল, গোপাল দাস, প্রদীপ দাস, খোকা বনিক, বলরাম দাস, বাসু দাস, নীলু দাস, তপন বনিক, প্রদীপ ভৌমিক, দুর্গেশ চক্রবর্তী, মন্টু সূত্রধর, খগেন শীল,

(C)Ishan Kotha

মিহিরলাল সূত্রধর, শিবানন্দ সূত্রধর, সুনীল সূত্রধর, কাজল সূত্রধর, পরেশ বনিক, অনুকূল দাস, রথীন্দ্র সূত্রধর, আনন্দ সরকার, বিজয় দাস, বলরাম মল্লিক, মোহাম্মদ ফকরুদ্দিন, রামজনম গৌর, শান্তি রঞ্জন বনিক, বিকাশ মজুমদার, কাজল দে, মহিবুর রহমান, শঙ্কর দাস, সজল কুমার দাস, শফিকুর রহমান, শ্রীদাম কান্ত দাস ও শ্রীবাস পাল।

করিমগঞ্জের চরবাজারে নোয়াখালী বস্তি নামে মূলতঃ ঠেলাওয়ালা, রিক্সাওয়ালা, বেতী শ্রমিক ও কয়েকজন কেরানী মুহুরী অধ্যুষিত এলাকায় কেন যে নেমে এলো পুলিশি নারকীয় তান্ডব !

রিক্সাচালক রবি সূত্রধর, খগেন শীল, অনুকূল দাস, ননীগোপাল দাস, ঠেলাগাড়ি চালক বাসু দাস, নীরু দাস এই অত্যাচারের শিকার হন। তাদের বিরুদ্ধে মামলাও সাজানো হয় থানা থেকে। ননী দাসের অবস্থা ছিল গুরুতর। বেতি শ্রমিক বাসুদেব দাস, বিজয় দাস, বলরাম দাস ও পুলিশি অত্যাচারের শিকার হয়ে হাসপাতালে যান। সুদক্ষিনা দাস নামক ৭০ বছরের বৃদ্ধা ব্যাপক নিগৃহীতা হয়েও কপাল জোরে বেঁচে যান। রেখারানী দাসের দেহে পাশবিক আক্রমণের ক্ষতচিহ্ন বহুদিন ছিল। খুকুরানী মন্ডলের সাথে পুলিশ অশ্লীল আচরণ করে এবং তা করতে গিয়ে এই নরপিশাচেরা তার দুবছরের শিশুটিকে বুকে আঘাত করে ও হাত ভেঙে দেয় - তার অপরাধ সে কান্না করেছিল।আরও জানা যায় যে মালতী সূত্রধরের ঘরদোর ভেঙে গুঁড়িয়ে দেয়া হয়। শ্রমিক সজল দাস ও কাজল দাসকে লাঠিপেটা করে কারাগারে নিক্ষেপ করা হয়। নোয়াখালী বস্তির প্রায় গৃহে এরকম সন্ত্রাসী অত্যাচার চালানো হয়।

ভাগ্যের কি পরিহাস ! এই কুখ্যাত অপারেশনের নেতৃত্বে যিনি ছিলেন তিনি এক বাঙালি পুলিশ অফিসার। হায় মির্জাফর ! আসামী খোঁজার নামে বৃদ্ধ, বৃদ্ধা, শিশু, নারী কাউকেই রেহাই দেয়নি মোহান্ত সরকারের পুলিশ।

এ ধরনের সন্ত্রাস চলতে থাকলো সুভাষ নগর, শ্রীনগর কলোনি, নীলমনি রোড, স্টীমার ঘাট, লঙ্গাই রোড, শিলচর রোড, পুরাতন স্টেশন রোড, ই এন্ড ডি কলোনি, গাছকালিবাড়ী প্রভৃতি শহরের বিভিন্ন স্থানে। বাড়ি থেকে ধরে নিয়ে গিয়ে জেলে পুরে যে অকথ্য অত্যাচার চালানো হয়েছিল, বিশেষতঃ কিশোর, তরুণ, ছাত্র, যুবাদের, সেই নিগ্রহের নমুনা দেখে এটা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে একটি উগ্র জাতিয়তান্ধ প্রতিহিংসা পরায়ন মনোভাবই কাজ করেছে। এখানকার ছাত্র যুবাদের এমনভাবে পঙ্গু করে ফেলতে চেয়েছিল যে ভবিষ্যতে ওরা যেন আর মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে না পারে। অধিকাংশের ই হাতে আঙ্গুলে পায়ে আজও রয়েছে নৃশংস আঘাতের ক্ষতচিহ্ন। কারো হাড় ভেঙেছে, কারো কোমর, কাউকে জননাঙ্গে আঘাত করা হয়েছে। পাড়ায় পাড়ায় চলেছে এমনি মাত্রাহীন সরকারি সন্ত্রাস - এর উদ্দেশ্য সম্ভবতঃ সবাইকে বুঝিয়ে দেয়া যে আসামে বাংলাভাষা আন্দোলনের পরিনতি কত ভয়ংকর হতে পারে। এমনও জানা গেছে যে একটি ছেলে বোম্বু দাওয়াই খেতে খেতে সহ্য করতে না পেরে জল চেয়েছিল - তাকে বলা হয়েছিল 'এই নে ভাষা, খেয়ে মর'। কুখ্যাত জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডে জেনারেল ডায়াসের মনোবৃত্তির সঙ্গে এর বোধহয় বেমিল খুব একটা বেশি নয়।

**সাংস্কৃতিক অবদমন ...**

-----------------------------------

আক্রমণ এসেছে সাংস্কৃতিক স্তরেও। স্বনামধন্য ভাস্কর প্রানকৃষ্ণ পাল, কালাচাঁদ পাল, রঞ্জিত পাল, জীবন কৃষ্ণ পাল ও মাধবচন্দ্র পালকে ধরে কারারূদ্ধ করে পিটিয়ে শয্যাশায়ী করে রাখার ঘটনা তারই ইঙ্গিত বহন করে। প্রায় মাসাধিক কাল পুলিশি সন্ত্রাসের রাজত্বে করিমগঞ্জ জেলা শহরের সাংস্কৃতিক প্রানস্পন্দন প্রায় বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, শ্মশানের শান্তিকে বুকে রেখে। ফলতঃ বাঙালির জনপ্রিয় দেবী মনসা, যার পুজো এতদঞ্চলের প্রায় প্রতিগৃহে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে, তার হলো মুষ্টিমেয় কিছু গৃহে আর তাও প্রতিমা বিহীন, কোলাহলহীন, নিঃসঙ্গীত, নিস্প্রাণ। হুল্লুড়ে কিশোর তরুণ লাল যে পলাতক। শহরের প্রিয়, প্রধান ভাস্কররা জেলে, স্বভাবতই অন্য ভাস্কররাও ভীত ও লুক্কায়িত। মা মাসিরা শোকে মূক ও মুহ্যমান। কবির সংবেদনে যা স্বতঃস্ফূর্ত বেরিয়ে আসে -

মনসা,এখানেও দুটো ছেলে লখিন্দর হলো
কাল স্বার্থে ?
ওদের বেহুলা নেই স্বর্গ থেকে প্রাণ এনে দেবে ।
আর্লি খুলে চেয়ে চেয়ে দেখি কেউটে বিষ
আকাশে আকাশে গোখরো, শঙ্খিনী, চন্দ্রবুড়ো
দু'হাতে আমূল টেনে ছেড়েছে হাওয়ায়
বাস্তুহারা ঘরছাড়া করে ।

এবারই প্রথম পুজো ঘটে ও নারকেলে
এবারই প্রথম ঢাকাঢাকি প্রতিমাবিহীন,

পুরোহিত মন্ত্র পড়ে অশীতিপরেরা বসে শোনে নেই সুর
কোথায় ভাস্কর ওঝা মা মাসীমারা
আমরা ছেলেরা আজ জলে ও জঙ্গলে।

অন্য অন্য বেদনায় তোমার পুরাণ আজ চাঁপা পড়ে যায়,
নীল বিষে আমরা লখাই
তুমি ,ওদের প্রাসাদে পুজো খাবে ?

বিষহরি বিষ হয়ে নেবে?

নাহয় বেহুলা হো, নতুন পুরাণ লেখা হবে ।

বিক্ষোভ মুখর বরাক

যাহোক, এতসব হেনস্তার নায়ক মুখ্যমন্ত্রীকে কিন্তু বরাকবাসী শান্তিতে সফর করতে দেয়নি ফকিরের বাজার থেকে হাইলাকান্দি ও শিলচর অব্দি পথেপথে বিক্ষোভ জানিয়েছে বরাক। করিমগঞ্জ থেকে বেরিয়ে মহন্ত র প্রথম কর্মসূচি ছিল ফকিরের বাজারে জনসভা। সেখানে মুখ্যমন্ত্রী পৌঁছানোর আগে পুলিশ শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভকারীদের ওপর লাঠিচালনা করে। জোর করে বন্ধ দোকানপাট খোলার প্রচেষ্টা ব্যার্থ হয়। কালো পতাকা গুলো পুলিশ নামিয়ে ফেলে। তাই সত্ত্বেও মুখ্যমন্ত্রী যখন সেখানে পৌছান তখন ভাষন শুনতে সামান্যই লোক ছিলেন, কালো ব্যাজধারী বিক্ষোভকারীদের সংখ্যা কিন্তু কম ছিল না। মুখ্যমন্ত্রী দ্রুত তার সংক্ষিপ্ত ভাষন সমাপ্ত করে দলবল নিয়ে নির্ধারিত করিমগঞ্জের পথ না ধরে ফাঁড়িপথে কর্ণমধু, গান্ধাই, নিলামবাজার হয়ে পাথারকান্দি সন্নিকটস্থ তিন্নখালে পৌছান। এই একটিমাত্র স্থানে সেদিন মহন্ত বিক্ষোভের সম্মুখীন না হয়ে সভা করতে সক্ষম হন। অবশ্য পাথারকান্দিতে একজায়গায় বিক্ষোভ প্রকাশ করা হয়।পাথারকান্দির পর কাছাড় চিনিকলের কাছাকাছি জায়গায় তিনরাস্তার মোড়ে শতাধিক চিনিকল শ্রমিক কর্মচারী্রা চিনিকল পুনরুজ্জীবনের দাবি জানিয়ে বিক্ষোভ দেখান।

আনিপুরের রাতাবাড়ি থানার ও সির হস্তক্ষেপে একটা অঘটন এড়ানো সম্ভব হয়। সেখানে প্রতিটি দোকানপাটে উড্ডীয়মান ছিল কালো পতাকা। একজন পুলিশ সাবইন্সপেক্টর একটি পতাকা নামানোর চেষ্টা করলে ছাত্রদের সঙ্গে পতাকা নিয়ে টানাটানি শুরু হয়। বন্দুকধারী একদল পুলিশ এগিয়ে এলে ব্যাপারটা গুরুতর আকার ধারণ করে। ঠিক এ সময়ে রাতাবাড়ি থানার ওসি ঘটনাস্থলে পৌঁছে ঘটনাটি আর গড়াতে দেননি। কয়েক মিনিটের মধ্যে মুখ্যমন্ত্রীর গাড়িও সেখান দিয়ে পার হয়ে যায়। কিছু সংখ্যক ছাত্র মুখ্যমন্ত্রীর কাছাকাছি এসে কালো পতাকা দেখায়। তাদের মুখে আওয়াজ ছিল "গো ব্যাক প্রফুল্ল মহন্ত"। রামকৃষ্ণনগরেও উড়েছিল কালো পতাকা।

Ishan Kotha

হাইলাকান্দিতে প্রবেশের পূর্বে আরো দুই জায়গায় মুখ্যমন্ত্রীকে বিক্ষোভের সম্মুখীন হতে হয়। এর প্রথমটি আয়নাখাল এবং দ্বিতীয়টি মনাছড়া। দুই জায়গায় প্রচুর সংখ্যক জনতা বিক্ষোভ দেখায়। উড়তে দেখা যায় কালো পতাকা, ছিল কালো ব্যাজ, আর ছিল বিক্ষোভের ধ্বনি। হাইলাকান্দি শহরে ঢোকার মুখেই মুখ্যমন্ত্রীকে প্রবল বিক্ষোভের সম্মুখীন হতে হয়। বিক্ষোভকারীদের ভেদ করে শহরে ঢুকতে মুখ্যমন্ত্রীকে রীতিমতো হিমসিম খেতে হয়। হাইলাকান্দির কর্মসূচির মধ্যে ছিল পৌরসভার সম্বর্ধনা, একটি জনসভায় ভাষণ ও হাসপাতাল সংলগ্ন এ জি পি অফিসের উদ্বোধন। তাঁর প্রতিটি কর্মসূচির সময়ে বাইরে চলছিল প্রচন্ড বিক্ষোভ আর পুলিশের লাঠিচালনা। "গো ব্যাক প্রফুল্ল মহন্ত, ফিরে যাও প্রফুল্ল মহন্ত" আওয়াজে চারদিক প্রকম্পিত ছিল।

হাইলাকান্দির পর মুখ্যমন্ত্রী এদিনের সর্বশেষ কার্যসূচি আলগাপুর সফরটিও নির্বিঘ্নে শেষ করতে পারেননি। আলগখপুর পুর-প্রশাসন মন্ত্রীর নিজের জায়গা -- এখান থেকেই তিনি নির্বাচিত হয়েছেন। কিন্তু আলগাপুরের একদল বিক্ষোভকারী ক্রমাগত তাদের বিক্ষোভ জানায়। সেখান থেকে মহন্ত কাটাখাল হয়ে রাত সাড়ে আটটায় শিলচর এসে পৌঁছান বলে জানা যায়।

২১শে জুলাই মুখ্যমন্ত্রীর সহযোগী মন্ত্রীরা ছিলেন সহিদুল আলম চৌধুরী, যতীন মালি ও উৎপল দত্ত। তাঁর সঙ্গী দু'জন পদস্থ পুলিশ অফিসারকে নিজেদের পুলিশ গাড়ীর চিহ্নাদি ঢেকে কিংবা মুছে দিয়ে দোয়ার বন্ধ করে শিলচর ঢুকতে হয়। একটি গাড়ির ভি আই পি লাইটকে কাপড় দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়েছিল। ফকিরের বাজার থেকে হাইলাকান্দি পর্যন্ত মুখ্যমন্ত্রীর কনভয় গাড়ির সংখ্যা ছিল গোটা দশেক। এর মধ্যে একটি এম্বুলেন্স ছিল। শিলচরে ঢোকার সময় গাড়ি ও পুলিশের সংখ্যা ছিল আরো বেশি।

**গুলিবর্ষণের প্রতিবাদে বিভিন্ন সংগঠনের প্রস্তাব ...**

-----------------------------------

করিমগঞ্জ ব্যাঙ্ক এম্পয়িস এসোসিয়েশন কো-অর্ডিনেশন কমিটির পক্ষে প্রণব গোস্বামী করিমগঞ্জে নিরীহ মানুষের উপর গুলি চালনার এবং পরবর্তীতে শ্রমিক কর্মচারী তথা নিরীহ জনগণের উপর চূড়ান্ত পুলিশি নির্যাতনের প্রতিবাদ সহ উচ্চ পর্যায়ের বিচার বিভাগীয় তদন্তের দাবি জানান। করিমগঞ্জ অল এমপ্লয়িজ ফোরামের এক বিবৃতিতে করিমগঞ্জে পুলিশের গুলি। চালানোর প্রতিবাদ করা হয়। তারা কার্ফু জারি করার পর কর্তব্যরত শ্রমিক কর্মচারী র প্রতি প্রশাসনের ঔদাসীন্য ও হাসপাতালে কিংবা রেডক্রস সোসাইটির রোগীদের প্রতি প্রশাসনের অমানবিক আচরণে ক্ষোভ প্রকাশ করেন। দুটি সংগঠন ই ২১শের ঘটনায় আহত ও নিহতদের উপযুক্ত ক্ষতিপুরনের দাবি জানান।

করিমগঞ্জ বার এসোসিয়েশন ও এডভোকেটস বার ২রা আগষ্ট এক সভায় ২১শের ঘটনার পর পুলিশী নির্যাতনের বিষয়ে আলোচনা করেন। তারা এক প্রস্তাবে বলেন যে বহু সংখ্যক লোককে গ্রেপ্তার করার পর নির্যাতন চালানো হচ্ছে এবং এটা ভাষা আন্দোলনকে দমন করার লক্ষ্যেই করা হচ্ছে। তাঁরা ক্ষতিগ্রস্তদের আইনগত সুবিধাদানের এক সিদ্ধান্ত নেন।

করিমগঞ্জের প্রধান সবকটি রাজনৈতিক দল গুলিবর্ষণের নিন্দা ও ঘটনার বিচার বিভাগীয় তদন্তের দাবি জানায়। দলগুলি নিরীহ মানুষের উপর পুলিশী নির্যাতনের নিন্দা ও নিহত আহতদের উপযুক্ত ক্ষতিপুরনের দাবি জানায়। এছাড়া, সারা ভারত গনতান্ত্রিক মহিলা সমিতির করিমগঞ্জ আঞ্চলিক কমিটি,লোয়াইরপোয়া গাঁও পঞ্চায়েত অধীনস্থ সর্বদলীয় সভা, বিভিন্ন ছাত্র-যুব ও মহিলা সংগঠনও অনুরূপ দাবি জানায়।

**ডি.সি ও কমিশনার কামিল্লার সভা ...**

-----------------------------------

২৮শে জুলাই ডেপুটি কমিশনার সুভাষ দাস করিমগঞ্জের বিশিষ্ট নাগরিকদের ডেকে এক সভা করেন। এই সভায় কমিশনার কামিল্লা সরকারের তরফ থেকে বক্তব্য রাখেন। সভার শুরুতেই ৬১'র ভাষাসৈনিক বর্ষীয়ান নেতা রথীন্দ্রনাথ সেন আমন্ত্রণ পত্রের ভাষার প্রতিবাদ করে বলেন ২১শের ঘটনা সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ভেঙে পড়ার কোনো ঘটনা নয়। তখন সরকারের তরফ থেকে দুঃখ প্রকাশ করে পরিস্থিতি স্বাভাবিক রণের ওপর এজেন্ডা নেওয়া হয়। শ্রী সেন ২১শে জুলাই থেকে শুরু করে এই কদিনের কার্যকলাপকে পুলিশী গুন্ডামি (administrative hooliganism) বলে আখ্যায়িত করেন এবং পুলিশকে ইউনিফর্ম ধারী গুন্ডা আখ্যা দেন। তিনি বলেন যে মনে হয় আমরা বিদেশী শাসনের অধীনে পরাধীন প্রজা হিসেবে আছি। পুলিশী অত্যাচার ও সন্ত্রাসের বর্ননা দিয়ে সরকারকে সতর্ক করে দিয়ে বলেন - প্রশাসন যেন মনে রাখেন যে এখানে মানুষ বাস করে, গরু ভেড়া নয়। অতঃপর বর্ষীয়ান জননেতা রণেন্দ্রমোহন দাস দীপ্ত ভাষায় রথীন্দ্র বাবুর বক্তব্য সমর্থন করে বলেন - সমস্ত ঘটনার যেন বিচার বিভাগীয় তদন্ত হয় এই নির্দেশ দেওয়া হোক। অধ্যাপক ডঃ সুশান্ত কুমার দাস বলেন যে অত্যাচারীর নাম ও সমস্ত বিবরণ তাঁর কাছে আছে, তাই কোনরূপ ধামাচাপা দেয়ার প্রক্রিয়াকে বরদাস্ত করা হবে না। তিন যুগের ভাষা সংগ্রামী নৃপতি চৌধুরী বলেন - তদন্তকে বানচাল করার জন্য সই সাবুদ টেম্পারিং করা হয়েছে। অধ্যাপক বিভাস দাস আক্ষেপ করে বলেন - প্রশাসন কেন নাগরিক দের এরকম সহযোগিতা কদিন পূর্বেই চাইলেন না। তাহলে আজ এই পরিস্থিতিরই উদ্ভব হতো না। অধ্যাপক মানিক সাহা প্রশাসনের উৎপীড়ন বন্ধ করার প্রতিশ্রুতি যাতে অবিলম্বে কার্যকর হয় সেই পরামর্শ দেন। অধ্যাপক সুজিত চৌধুরী বলেন - পরিস্থিতির পুনরুদ্ধার বলতে জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকারের পুনরুদ্ধার বোঝায়। প্রশাসন যেন শান্তিপূর্ণ সভা, মিছিল ইত্যাদির অধিকার ফিরিয়ে দেন। ডি.সি ও কমিশনার উভয়েই এই প্রস্তাবে সম্মতি জানান।

**প্রতিশ্রুতি বনাম প্রহসন ...**

-----------------------------------

অধ্যাপক ডঃ সুজিত চৌধুরী জানান যে সরকার সেই প্রতিশ্রুতি অর্থাৎ জনগনের গনতান্ত্রিক অধিকার ফিরিয়ে দেবার সিদ্ধান্তকে প্রহসনে পরিনত করেছেন। কাল ২৯শে জুলাই তিনি রবীন্দ্রসদন কলেজের শিক্ষকদের নিয়ে একটি মৌন শোভাযাত্রা তথা ২১শে জুলাইএর শহিদদের স্মৃতিতে একটি শোকমিছিলের অনুমতি দিলেও কার্যক্ষেত্রে তা খেলাপ করে প্রশাসন একে প্রহসনে পরিনত করেন। কলেজ শিক্ষকদের প্রতি প্রশাসনের এমন অশ্রদ্ধাশীল দৃষ্টিভঙ্গিকে ন্যাক্কারজনক বলে ওয়াকিবহাল মহলের সবাই ক্ষোভ প্রকাশ করেন।

**আসাম বিধান সভায় আনীত মুলতবি প্রস্তাব ...**

-----------------------------------

৪ঠা আগষ্ট ' ৮৬ তে আসাম বিধানসভার বাদল অধিবেশনে ২১শে জুলাইয়ের ভাষা আন্দোলনের বিক্ষোভকারীদের উপর পুলিশের গুলি বর্ষন এবং সমগ্র উপত্যাকায় পুলিশী সন্ত্রাসের বিষয়টি আলোচনার জন্য সি.পি.এম, ইউ.এম.এফ, কংগ্রেস (আই), এস.ইউ.সি, কংগ্রেস (এস) - এই বিরোধী দলগুলোর সদস্যরা একটি মুলতবি প্রস্তাব আনার অনুমতি চাইলে অধ্যক্ষ তা নাকচ করে দেন। এর প্রতিবাদে এরা একযোগে সভাকক্ষ ত্যাগ করেন। পরে সি.পি.এমের হেমেন দাস, রামেন্দ্র দে, কংগ্রেস (আই)এর আলতাফ হোসেন মজুমদার, ইউ.এম.এফের অর্ধেন্দু দে, এস.ইউ.সির জয়নাল আবেদিন চারটি মুলতবি প্রস্তাব উত্থাপন করেন। প্রস্তাবের পক্ষে বক্তব্য রাখেন আলতাফ হোসেন মজুমদার ও সেভেন দাস।

**মুখ্যমন্ত্রীর এই সফরের উদ্দেশ্য ...**

-----------------------------------

মুখ্যমন্ত্রীর বরাক সফরের গোপন উদ্দেশ্য ছিল এলাকার সাম্প্রদায়িক ও ভাষিক সম্প্রীতি নষ্ট করা - এমন অভিযোগ ও অভিমত বরাকের বহু বুদ্ধিজীবী ও তথ্যভিজ্ঞ মহলের। মিজোরাম গামী কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভার প্রতিনিধি দলের সঙ্গে কুম্ভীরগ্রাম বিমানবন্দরে শিলচর কংগ্রেস (ই)র এক প্রতিনিধি মন্ডলী দেখা করেন। প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ও তৎকালীন এম এল এ আলতাফ হোসেন মজুমদার খুব জোরালো ভাষায় ২১শে জুলাই এর গুলিচালনা ও তৎপরবর্তী সন্ত্রাসের বিবরণ তুলে ধরেন। তিনি বলেন মুখ্যমন্ত্রীর মূল উদ্দেশ্য ছিল বরাক উপত্যকার অটুট সম্প্রীতিতে ফাটল ধরানো। তাঁর বিভিন্ন স্থান নির্বাচনের মধ্যেই তার প্রমাণ রয়েছে। আলগাপুরে উনি ২৫ বছর আগের নিহত সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাবাজদের ১৯শে জুনের শহিদ বলে ঘোষণা করেছেন। ১৯৬১ সালে হাইলাকান্দির হাঙ্গামা ও গুলিবর্ষণে নিহতদের অর্থমঞ্জুরী করেছেন, তাতে আপত্তির কিছু নেই , কারণ এরা ছিলেন দরিদ্র মানুষ এবং একটি কুট চক্রান্তের শিকার। কিন্তু এদেরে অসমীয়া ভাষী বলে ঘোষণা করে শহিদ আখ্যা দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী কি বলতে চান এরা সত্যিই অসমীয়াভাষী ছিল ? পুলিশী সন্ত্রাসের ভয়ে আমাদের বহু ছেলে পার্শ্ববর্তী ত্রিপুরা রাজ্যে চলে গেছেন। এটি আসাম সরকারের লজ্জার কথা। শোনা যাচ্ছে বহু ছেলে নদী সাঁতরে বাংলাদেশে আশ্রয় নিয়েছে। এর একটা রাজনৈতিক তাৎপর্য দাঁড়াতে পারে - তা যেন কেন্দ্রীয় সরকার বিস্মৃত না হন।"

মুখ্যমন্ত্রী ২১শে জুলাই উপহার দিলেন দুভাবে -

১) করিমগঞ্জে বাংলাভাষা সংগ্রামী দের উপর গুলি বর্ষন করে এবং মাসাধিককাল পুলিশী সন্ত্রাস অব্যাহত রেখে ছাত্র যুবকদের পঙ্গু তথা গৃহতাড়িত করে।

২) হাইলাকান্দির কুখ্যাত দাঙ্গাকারী সমাজদ্রোহীদের অসমিয়া ভাষার শহীদের মর্যাদা দিয়ে - যারা ছিল ১৯শে জুনের ভাড়াটে দাঙ্গাকারী, বাংলা ভাষায় অর্থাৎ আপন মাতৃভাষায় 'অসমিয়া রাজ্যভাষা চাই' বলে স্লোগান যাদের মুখে তুলে দেওয়া হয়েছিল টাকার বিনিময়ে।ওদেরই পরিবার পিছু ত্রিশ হাজার টাকা অনুদান দিয়ে তিনি তাঁর আগমনের পিছনের গোপন চক্রান্ত টিকেই খুলে ধরলেন, এরা তো তাঁরাই যারা বাঙালি হয়ে ভিনবর্গের বাঙালিদের ঘরবাড়ি পুড়িয়ে দিয়েছিল সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধাবার উদ্দেশ্যে। বস্তুত ১৯শে জুন ছিল এমন একটি ঘটনা যা দীর্ঘদিনের সংগ্রাম, আত্মত্যাগের বিনিময়ে চূড়ান্ত মোমেন্টামের মুখে '৬১এর ভাষাসংগ্রাম অনেকটাই মুখ থুবড়েই পড়ে গিয়েছিল। বরাক তথা আসামের বাঙালিদের সে যে চরম বিপর্যয়। মুখ্যমন্ত্রীর অশহীদকে শহীদ বানানোর চক্রান্তে নির্মিত এ একই মঞ্চ থেকে যখন বরাকের মন্ত্রী শহিদুল আলম চৌধুরীর মুখে বরাকের ভাষা বাংলা নয় বলে বিভ্রান্তি কারী বক্তব্য নিঃসৃত হচ্ছিল, তখন ষড়যন্ত্রের স্বরূপ বুঝে নিতে কারোর মনে কোন দ্বিধা থাকার কথা নয়। এটাও স্পষ্ট হয়ে যায় যে এই ষড়যন্ত্র ছিল পূর্ব পরিকল্পিত। যাহোক বরাকবাসী এবার সজাগ ছিল বলেই ঘাতকদের হাতে ছুরি তুলে দেবার এই সংগ্রাম বিরোধী চক্রান্তের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিল।

Ujjan Kotha

**২১শের সাফল্য এবং ...**

-----------------------------------

শতশত কারারুদ্ধের উপর বিভিন্ন সাজানো মামলা টেকাতে পারেনি সরকার। সাক্ষী ও প্রমানাভাবে একে একে সব বন্দীকেই মুক্তি দিতে হলো। অথচ কেউই জামিনের আবেদন করেনি।

১৯৭২ এর পর ১৯৮৬ তে ফের যখন ভাষা সার্কুলার প্রয়োগের চেষ্টা করা হলো তখনই গড়ে উঠলো ২১শে জুলাই এর আন্দোলন। বরাকের বাঙালিদের ভাষিক অধিকারের প্রশ্নে এটা হচ্ছে তৃতীয় দফা বক্তক্ষরণ। এর ফলে সম্ভব হলো SEBA CI RCULAR কে রুখে স্তব্ধ করে দেওয়া।বিফল যায়নি অগ্নিউপাষকদের এই রক্ত তর্পন। শহীদ দিব্যেন্দু দাস ও শহীদ জগন্ময় দেবের (জগন-যীশু) জীবনের বিনিময়ে রক্ষিত হল আমাদের মাতৃভাষায় অধ্যয়নের অধিকার। দাবির কাছে নতিস্বীকার করতেই হলো সরকারকে। কিন্তু আত্মতৃপ্ত হওয়ার দিন এখনো আসেনি। সরকার সার্কুলারটি স্থগিতই রেখেছে শুধু , প্রত্যাহার করেনি।

অসম সাহিত্য সভার মস্তকলালিত স্বপ্নের বাস্তব রূপকার আসাম সরকার সেই স্বাধীনতার লগ্ন থেকেই নানাভাবে চেষ্টা করে আসছে মূল বাংলারই বিক্ষিপ্তখন্ড গোয়ালপাড়া এবং কাছাড় জেলা (বর্তমান বরাক উপত্যকার) কে অসমিয়াকরণে উত্তীর্ণ করতে। প্রথমটির ইতিমধ্যে কাজ সম্পুর্ন। দ্বিতীয় টির সাধ আজও পূর্ণ না হলেও ছলে বলে কৌশলে সেই পথেই এগোনোর চেষ্টার কসুর করছে না কখনোই। কংগ্রেসের হাতে ক্ষমতা থাকাকালীন দু দু'বার অগপ শাসনকালে একবার অসমিয়া ভাষা চাপানোর চেষ্টা তো হলোই। ভাষা দাঙ্গার ও তো দাওয়াই দেয়া হলো দু'তিনবার। নবপন্ডিতদের দ্বারা বরাকের ভাষাকে অসমিয়ার আঞ্চলিক উপভাষা বলে প্রমাণ করার অপচেষ্টা এখনো প্রবল। তদুপরি ভাষা আইনকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে অফিসের ফর্ম, আবেদন পত্র, রেশন কার্ড, সরকারি প্রচার পত্র ইত্যাদি অসমিয়া ভাষায় ছাপানো হচ্ছে। কোথাও কোথাও বিধান সভার বিজয় উৎসবের দিন থেকেই দেখা যায় রাতারাতি মাইলস্টোনের ভাষা পর্যন্ত অসমিয়াতে পরিবর্তিত হয়ে যায়। বাংলাভাষায় লিখিত সরকারি পাঠ্য বইতে সুকৌশলে অসমিয়া শব্দ ও ভাষিক প্রয়োগ কৌশলকে নগ্নভাবে ঢুকিয়ে দেওয়া হচ্ছে। হটাৎ নির্দেশ এসে যাচ্ছে যে প্রাথমিক ছাত্র দের প্রশ্নপত্র অসমিয়াতে ছাপাতে হবে - ইত্যাদি।

ফলতঃ ১৯৬১, ১৯৭২, তারপর ১৯৮৬ - এই তিন তিনবারের রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের পরও সরকারের বিজাতীয় আগ্রাসন নীতির t r adi t i on সমানে চলেছে। মুখ পাল্টায়নি, পাল্টিয়েছে মুখোশ।

অতএব সাধু সাবধান। রক্তদানের হাতছানি দুয়ারে ফের কড়া নাড়তেই পারে।

*তথ্যসূত্র –*

*প্রধান তথ্যসূত্র: সাপ্তাহিক যুগশক্তি, করিমগঞ্জ*


*1. Assam Accord, January, 1986*

*2. SEBA Circular*

*3. GR Case Records (1986)*


(C)Ishankotha